# জিহাদ

## মো: জামিলুল বাসার

আল্লাহ-রাছুল তথা কোরান বিরুদ্ধ হাদিস-ফেকহা ও ফতোয়া প্রণীত শরিয়ত জেনে-না জেনে বরং অহং (শিরক) তাড়িত হয়ে যে বিয়য়টি নিয়ে ১৪ শত বৎসর যাবৎ বিশ্বময় অশান্তি ও অরাজগতার সৃষ্টি করে ইসলাম তথা শান্তিবাদ পদে পদে পদদলীত করছে, তা হলো 'জিহাদ।'

**সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষের আলোকে জিহাদ:**

**'জিহাদ' অর্থ:** চেষ্টা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ধর্মযুদ্ধ; জা-হা-দ ধাতু থেকে উৎপন্ন। জাহাদ অর্থ: চেষ্টা করল, পরিশ্রম করল; জিহাদ অর্থ: সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করল, অধ্যবসায় সহকারে কাজ করল, সংগ্রাম করল ইত্যাদি। 'যারা আমাদের (উপলব্দির) জন্য কঠিন পরিশ্রম করে (জিহাদ) আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথের সন্ধান দিয়ে থাকি; আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে থাকেন।' [আনকাবুত-৬৯]

মুহাম্মদের (সা) মক্কায় প্রচার জীবনের সময়কালীন অবতীর্ণ আয়াতে, যেখানে জিহাদ শব্দের উল্লেখ আছে সেখানে কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অর্থে এই শব্দের ব্যবহার হয়নি। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সৎকর্ম সাধনে বাধা সৃষ্টি করে বলে প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করতে হয় ইহাই 'জিহাদ' শব্দটি ব্যবহারের অন্যতম তাৎপর্য। প্রসিদ্ধ কবি-দার্শনিক আবুল আতাহিয়ার একটি আরবী চরণের অনুবাদ: 'সর্বাপেক্ষা কঠিন জিহাদ প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ধাতব অস্ত্রের প্রয়োগ নেই।' চরণ দু'টির সমর্থনে উল্লেখিত আয়াতসহ কোরান ঘোষনা করে, 'তোমরা কাফিরদের আনুগত্য করিও না, বরং ইহার (কোরানের) সাহায্যে তাদের সহিত কঠিন জিহাদ করে যাও। [দ্র:ফুরকান-৫২] এক্ষেত্রে জিহাদের অস্ত্র কোরানের বিবৃত যুক্তি ও প্রজ্ঞা মাত্র [পশু শক্তি বা ধাতব অস্ত্র নয়]। তবে (মানষিক) চাপ প্রয়োগ অর্থেও 'জিহাদ' শব্দটির প্রয়োগ আছে, যেমন: 'যদি তোমার পিতামাতা তোমর জ্ঞান-বুদ্ধির বর্বর অংশীবাদ স্বীকার করার জন্য তোমার সঙ্গে জিহাদ করে অর্থাৎ (মানসিক) জোর চাপ প্রয়োগ করে তবে তুমি তাদের অনুগত হইও না' [দ্র: আনকাবুত-৮; লুকমান-১৫]

কাফিরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি বা নির্দেশের ক্ষেত্রে সাধারণত 'কতল' শব্দের ব্যবহার দেখা যায় [নিছা-৭৬] সর্বপ্রথম যুদ্ধের অনুমতিবহ আয়াতেও জিহাদ নয় বরং 'কিতাল' শব্দের ব্যবহার আছে [হাজ্জ-২৯] ছুরা বাকারার ১৯০ থেকে ১৯৩ পর্যন্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আয়াতগুলিতে একবারও 'জিহাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। কোরানে 'কুতেবা আলাইকুমুল কাতেলু' দেখা যায় [দ্র: বাকারা-২১৬.২২৬] কিন্তু 'কুতেবা আলাইকুমুল জিহাদ' (অর্থাৎ 'জিহাদ ফরজ করা হয়েছে)' দেখা যায় না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কেবল 'জিহাদ' শব্দের ব্যবহার কাফিরদের বিরুদ্ধে শক্তির লড়াই সুচনা করে না বরং এ অর্থ প্রকাশের জন্য কোরানে জিহাদ শব্দের সঙ্গে কতল শব্দের ব্যবহার, ক্ষেত্র বিশেষের চাহিদা অনুযায়ী আরও কতক বিশেষ শব্দের ব্যবহার এবং আরবী ভাষায় প্রচলিত বাকরীতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে; জিহাদ শব্দের পরিবর্তে বরং কতল এর ব্যবহারই বেশী। অন্য কথায় শক্তি প্রয়োগ ব্যঞ্জক বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহার না পাওয়া গেলে কোরানের ব্যবহৃত জিহাদ দ্বারা এই শব্দের ব্যুৎপতিগত অর্থই কেবল বুঝাবে অর্থাৎ **যথাসাধ্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর আদিষ্ট জীবন-পন্থা অনুসরণ করাই বুঝতে হবে।**

ব্যপক অর্থে ব্যবহারের উপযোগিতার দরুন 'জিহাদ' শব্দে অস্ত্রযুদ্ধও ক্রমে ক্রমে শামিল হয়ে যায়। কারণ যুদ্ধের মধ্যে শ্রম, অধ্যবসায় এবং পরিণামে চরম ত্যাগের অর্থাৎ জীবন দানেরও প্রয়োজন পড়ে। এই কারনে হাদিসে এবং ফিকহে পারিভাষিকভাবে (দলিয় বিকৃত অর্থ) জিহাদ শব্দটি ইসলাম হননে বদ্ধপরিকর শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হ'তে লাগল। (পরবর্তিতে) 'কিতাবুল জিহাদ' শিরোনামে যুদ্ধ সংক্রান্ত হাদিস এবং আলোচনা বিন্যস্ত হয়। তখন থেকে জিহাদের পারিভাষিক (বিকৃত) অর্থটি ইহার ব্যুৎপতিগত (মুল) অর্থকে ছাড়িয়ে গেল। তবে কোরানে 'জিহাদ' শব্দের প্রত্যেকটি ব্যবহারের অন্তরালে কাফির বধের বিভীষিকা কল্পনায় আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই।

কোরান নিছক ক্ষাত্রশক্তি প্রদর্শন, গোত্রগত গৌরব রক্ষা বা দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ অনুমোদন করে না। আত্ম রক্ষা (বাকারা- ১৯০) জনগণের জানমাল আবরু রক্ষা (নিছা-৭৫) বিবেকের স্বাধীনতা তথা ধর্মীয় স্বাধীনতা (নিরপেক্ষতা) রক্ষা (হাজ্জ-৪০) ফেতনা অর্থাৎ সমাজে বিশৃঙ্খলা রোধ (বাকারা-১৯৩) ইত্যাদির জন্য কোরান ইহার অনুসারিগণকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার নির্দেশ দেয়--। [তথ্যসুত্র: সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ; ১ম খ. পৃ: ৪০২-৪০৫]

উল্লেখিত বিস্তারিত আলোচনায় এটাই প্রমানিত যে, প্রচলিত শরিয়ত দলীয় স্বার্থে 'জিহাদ' শব্দটির চরম অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার করে নিরীহ সরলপ্রাণ জনসাধারণকে পথ ভ্রষ্ট করে সমাজে গোলযোগ ও অশান্তি সৃষ্টি করেছে এবং আল্লাহ-রাছুল প্রণীত কোরানিক ইসলামকে কলঙ্কিত করেছে।

আরবী 'হার্ব' শব্দের অর্থ যুদ্ধ, 'সিরা-আ' অর্থ মারামারি, 'মা-আরাকা' অর্থ লড়াই আর 'কিতাল' অর্থ হত্যা। পক্ষান্তরে 'জিহাদ' অর্থ আল্লাহ উপলব্দির জন্য ত্যাগ, সাধনা বা ব্যক্তির একনিষ্ট ধর্মানুশীলণ এবং একমাত্র উহাই রক্ষায় 'ধর্ম যুদ্ধ' দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করা যায়; আর ধর্মের মুল বিষয়বস্তু, বৈশিষ্ট ও ইতিবৃত্ত 'ইসলাম,' শান্তি বা ওঁম ধারণ ও রক্ষণ। অতএব শান্তি যুদ্ধ বলতে যুদ্ধ, হত্যা বা আক্রমণ কোন অবস্থাতেই ইসলাম অনুমোদন করে না বরং চুড়ান্তভাবেই হারাম। অতএব ধর্ম যুদ্ধ বলতে আত্মরক্ষা বা জীবণ বিপন্ন হলে প্রতিরোধ

বুঝায়; আক্রান্ত হলে আত্ম রক্ষাই জিহাদের মর্মার্থ এবং প্রধান শর্ত। তৎকালীন পৌত্তলিকগণ মোসলেমদের উপর আক্রমণ, নির্যাতন না করলে, রাছুল [সা] আক্রান্ত না হলে ২২ বৎসরে একটি যুদ্ধও হতো না এমনকি একফোটা রক্তও ঝরতো না। আল্লাহর রাছুল নিজেই ঘোষণা দেন যে, ধর্ম প্রচার সকল জাতির সমান অধিকার; কেউ কাউকে বাধা দেয়ার অধিকার নেই; যার যার ধর্ম তার তার কাছে। অতঃপর আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ অনিবার্য হয়ে দাড়ায় এবং উহাই 'জিহাদ' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ। ইসলামী বিশ্বাকোষের আলোকে মহানবীর ২২ বৎসরের ২৩টি যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত নির্দেশ ছিল নিম্নরূপ:

ক. বাড়াবাড়ি করিও না, প্রবঞ্চনা করিও না, মৃত শত্রুর অঙ্গচ্ছেদ করিও না, শিশু বধ করিও না, বৃদ্ধ এবং নারী হত্যা করিও না।

খ. যুদ্ধারম্ভের পুর্বে শত্রুকে হয় ইসলাম গ্রহণ নতুবা বশ্যতা স্বীকার অথবা জিজিয়া কর প্রদান করার আহ্বান জানাও; শত্রুকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিও না।

গ. তাদের সহিত যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা নির্বাপিত না হয় এবং আল্লাহর দীন অর্থাৎ শান্তিপুর্ণ ন্যায়-নীতি ভিত্তিক সমাজ (সার্বিক নিরপেক্ষতা) পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হয়। শত্রু যখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি থেকে বিরত হয় তখন বিশেষ দন্ডযোগ্য অত্যাচারী ছাড়া অন্য কাহারও উপর অত্যাচার বা অস্ত্র প্রয়োগ চলবে না।(বাকারা-১৯৩)।

ঘ. যুদ্ধরত কোন মুশরিক আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দিও যাতে সে আল্লাহর কালাম শোনে, (এবং চিন্তা করতে পারে তার পক্ষে মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ যুক্তিযুক্ত কি না, যদি সে শত্রুতা পরিহার না করে) অতঃপর তাকে তার পক্ষে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দাও। এ নির্দেশ এজন্য যে, তারা একটি অজ্ঞ সম্প্রদায়'(তওবা-৬) অর্থাৎ আশ্রয় প্রার্থি শত্রুকে বধ করা কিংবা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নিষিদ্ধ (হারাম)।

ঙ. যখন তেমারা আক্রান্ত হও তখন তাদের বধ করা তোমাদের জন্য বৈধ; হত্যযজ্ঞের আশংকা না থাকলে তাদের বন্দী কর। হয় ক্ষমা কর বা মুক্তিপণে ছেড়ে দাও।

উপরোক্ত নীতিমালা থেকে যুদ্ধমুলক জিহাদের উদ্দেশ্য এবং 'ফি ছাবিলিল্লাহি' (নিঃস্বার্থ) কথাটির তাৎপর্য পরিস্কারভাবে বুঝা যায়। 'যদি আল্লাহ একদল লোকের দ্বারা অপর দলের প্রতিরোধ ব্যবস্থা না করতেন তবে মঠ, মন্দির, গির্জা সিনাগগ, মসজিদ যাতে আল্লাহর নাম অধিক কীর্তিত হয় এই সবই চুরমার হয়ে যেত' (হাজ্জ-৪০) এই আয়াতে কোরানের অনুসারীদের উপর ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় রক্ষার জন্য যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশপের অনুমতি সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা) বিজিত রাজ্যের খৃষ্টানদের গির্জায় সালাত অনুষ্ঠানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন, পাছে মুসলিমগণ ইহাকে মসজিদে পরিণত করে। (তথ্যসুত্র: স. ই.বিশ্বকোষ; পৃ: ৪০৪ ,৪০৫)

**আত্মরক্ষামুলক যুদ্ধ বা জিহাদের বিধান:**

প্রধানত অস্ত্র ধারণ, খুণ-খারবী, সমাজে গোলযোগ ও অশান্তি সৃষ্টি মদ-শুকরের মাংসের চেয়েও হারাম; কিন্তু অনন্যোপায় হলে: কলমের বিপরীতে কলম; কথার বিপরীতে কথা আর রক্তের বিপরীতে রক্ত দিয়েই প্রতিরোধ করার বিধান আছে; উহার অতিরিক্ত করার অর্থই সীমা লঙ্ঘন এবং উহাই চুড়ান্ত কুফুরী। তারপরেও ক্ষমা করে দেয়াই আল্লাহর বেশী পছন্দনীয়। দলিয় বিশ্বাস, ক্ষমতার লোভ ও ভাবাবেগে তাড়িত না হয়ে কোরানে বর্ণিত জিহাদ নয় বরং যুদ্ধের কঠিণ শর্তাবলী প্রত্যেক মুসলমানের লক্ষণীয় এবং জরুরী পালণীয়:

১. অ কাতাবনা----যলেমীন। [মায়েদা-৪৫-৪৯] অর্থ: তাদের জন্য বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করলে উহাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই জালিম,ফাসেক ও কাফের।

২. অ ইন----ছবেরীন। [নাহল-১২৬] অর্থ: যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে: যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে [ক্ষমা করলে] ধৈর্যশীলদের জন্য ইহা অতি উত্তম।

৩. অল্লাজিনা----যলেমীন। [শুরা-৩৯ ,৪০] অর্থ: এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে: মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করে না।

৪. অ কাতেলু ফি ছাবিলে--- কাফেরীনা--রাহিম। [বাকারা-১৯০,১৯১] অর্থ: যারা তোমাদের হত্যা করে, তোমরাও তাদের আল্লাহর নামে (পরার্থে) হত্যা কর; কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করিও না। আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীকে ঘৃণা করেন। যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কৃত করেছে তোমরাও তাদের সেখান থেকে বহিষ্কার কর। অশান্তি সৃষ্টি খুণ অপেক্ষাও গুরুতর পাপ। সংরক্ষিত মসজিদের নিকট কখনও যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে। যদি তারা তোমাদের হত্যা করে তবে তোমরাও তাদের হত্যা করবে; ইহাই কাফিরদের পরিণাম। যদি তারা বিরত হয় তবে [তোমরাও বিরত হও] আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

**অর্থাৎ আক্রমণাত্বক যে কোন ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত মোসলেমদের অগ্রে অস্ত্র স্পর্শ করা চরমভাবেই নিষিদ্ধ এবং মদ-শুকরের চেয়েও হারাম।**

অতএব বর্তমানে যাদের হাতে অস্ত্র আছে তারা কোরানের অমোঘ নির্দেশ অনুসারে এমুহূর্তে হয় অস্ত্র ত্যাগ করুক নতুবা মোসলেম নাম ত্যাগ করুক। বলাবাহুল্য যে তারা এতক্ষণে 'মোসলেম' নাম ত্যাগ করে শিয়া ইসনে আশারিয়া **মোসলেম**, শিয়া দুরুজ ফেরকা **মোসলেম**, সুন্নী হানাফি **মোসলেম**, সুন্নী শাফেঈ **মোসলেম**. সুন্নী আহমদী **মোসলেম** ইত্যাদি নতুন নাম ধারণ করেছেন এখন মাত্র শেষের শব্দটি ত্যাগ করা দরকার।

উল্লেখিত আয়াতগুলি শরিয়তি জিহাদের প্রধান শর্ত; উহাতে যুদ্ধের ডামাডোল, গুম,খুণ, গোপন আক্রমণ বা সন্ত্রাস, শক্তি প্রয়োগের তিল পরিমাণ অনুমতি নেই। প্রচলিত শরিয়ত আয়াতগুলি গোপন রেখে আংশিক মাত্র নিম্ন আয়াতগুলি প্রচার করে সরল বিশ্বাসী মোসলেমদের (ভদ্র, আদর্শ) বিভ্রান্ত করেছে। পক্ষান্তরে মৌলবাদের ঐ একই সুত্র মতে স্বঘোষীত নাস্তিকগণও ঐ খন্ডিত আয়াতগুলি তুলে ধরে ধর্মের নামে সমাজ, দেশ তথা বিশ্বে অরাজগতা, অশান্তি সৃষ্টি ফরজ বলে প্রতিষ্টা করতে সক্ষম হয়েছে; আর মহানবীকে একজন যোদ্ধা, সন্ত্রাসী, খুণী ও সম্প্রসারণবাদী হিসাবেও প্রতিষ্টা করতে সক্ষম হয়েছে।

ক. কুতেবা আলাইকুম----খাইরুল্লাকুম--। [বাকারা-২১৬] অর্থ: তোমাদের জন্য হত্যার [জিহাদ] বিধান দেয়া হলো যদিও তোমাদের নিকট ইহা অপ্রিয়; কিন্তু তোমরা যা পসন্দ কর না সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর--।

খ. অ কাতেলু---আলীম। [বাকারা-২৪৪] অর্থ: তোমরা আল্লাহর নামে [স্বার্থহীণ] হত্যা [জিহাদ] কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

গ. ইনফেরু---তালামুন। [তওবা-৪১] অর্থ: তোমরা বেরিয়ে পড় হালকা ভারী যে সাজ সরঞ্জাম পাও তাই নিয়ে আর আল্লার রাহে নিজেদের জান-মাল দিয়ে প্রতিরোধ [জিহাদ] কর। [প্রকাশ থাকে যে উল্লেখিত আয়াতেও 'জিহাদ' শব্দটি নেই, আছে 'কতল।'

আপন জ্ঞাতিগোষ্ঠি হত্যার বিষয় কোরানের নির্দেশ দেখুন এবং নিজকে মুমীন দাবি করলে অবশ্যই অনুসরণ করুণ আর যারা আয়াতগুলি অস্বীকার করে ক্ষমতার লোভে নিরীহ যুবকদের প্রলুব্ধ করে সমাজে অরাজগতার সৃষ্টি করছে তাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে আয়াতগুলি দেখিয়ে দিন; অতঃপর কোরানের প্রতি ফিরে না আসলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, খুনী, কোরান অমান্যকারী হিসাবে সনাক্ত করা ও জনমত গড়ে তোলা প্রতিটি মোসলেমের [আদর্শ লোকের] দায়িত্ব।

১. ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা---ইয়াছিরান। [নিছা-২৯,৩০] অর্থ: হে ভক্তগণ [মোমেনগণ]! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না; --- নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে হত্যা করিও না।---এবং যে কেহ হত্যা [সীমা লঙ্ঘন] করে, তাকে অবশ্যই আগুনে দগ্ধ করবো; যা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।

২. অমা কানা----হাকিম। [নিছা-৯২] অর্থ: কোন মুমীনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নহে, তবে ভুল বশতঃ করলে উহা স্বতন্ত্র; এবং কেহ কোন মুমিনকে ভুল বশতঃ হত্যা করলে এক মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ শোধ করা জরুরী; যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের কোন মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা ফরজ। আর যদি সে এমন এক জাতির হয় যার সঙ্গে তোমরা চুক্তিবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ এবং মুমিন দাস মুক্ত করা ফরজ এবং যে সংগতিহীন সে একাদিক্রমে ২ মাস রোজা পালন করবে। অনুতপ্ত ও অনুশোচনার (তওবার) জন্য ইহা আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৩. মিন আজলে---লামুছরেফুন। [মায়েদা-৩২] অর্থ: এ কারণে বনি-ইস্রাইলদেরও এই বিধান ছিল যে, হত্যার পরিবর্তে হত্যা এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্বক কাজ করা ছাড়া কেই কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।

উল্লেখিত বিস্তারিত আয়াতগুলি উপেক্ষা করে যে বা যারা অহরহ ধর্মের নামে অধর্ম চালিয়ে সমাজ জীবণ বিপন্ন করে চলছে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের উপরই নিজেদের জিহাদ আপতিত হওয়ার প্রকাশ্য অনুমোদন দান করছেন। 'আল্লাহ যে সত্তর হিসাব গ্রহণকারী', 'আঘাতের প্রতিঘাত অবশ্যম্ভাবি' তারা বেমালুম ভুলে গিয়ে, দলিয় ও সাম্প্রদায়িক ইমাম আবুহা হানিফা, বোখারী ও খুণী মওদুদীগংদের উপর ঈমান এনে নিজেদের মোনাফেক ও খুণী আসামীর খাতায় নাম লিখিয়েছেন।

অতএব অচিরেই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এমন একটি দলের আবির্ভাব হওয়া উচিৎ যারা দেখা মাত্রই আসামীদের সনাক্ত করে রক্ত প্রবাহ বন্ধ করতে পারে; এছাড়া অন্য কোন পথ আর খোলা নেই; কারণ কোরান ঘোষণা করে:

১. ইন্নাল্লাজিনা---লা ইউমেনুন। [বাকারা-৬} অর্থ: যারা অহংকার [কুফুরী] করে তাদের সতর্ক করা না করা উভয়ই সমান। তারা বিশ্বস্থ হবেই না।

২. খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম--- আজাবুন আজিম। [বাকারা-৬,৭] অর্থ: আল্লাহ তাদের হৃদয়, কর্ণ ও চোখে সিল্ মেরে দিয়েছেন, তাদের জন্য রয়েছে কঠিণ শাস্তি।

৩. অমিনান্নাছি---ইউমেনুন। [বাকারা-৮] অর্থ: মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও পরিণামে বিশ্বাসী'

কিন্তু তারা মুলে বিশ্বাসী নয়।

৪. অ ইজা কিলা মুসলেহুন। [বাকারা-১১] অর্থ: তাদেরকে যখন বলা হয়‘ সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করিও না,’ তারা বলে,‘আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।’

৫. আ আলা---ইয়াসউরুন। [বাকারা-১২] অর্থ: প্রস্তুত থেকো! ইহারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী। কিন্তু তারা স্বীকার করে না।

**গায়-গতর, স্বভাব-চরিত্রে আল্লাহ তাদের কয়েদী পোষাক পরিয়েই দিয়েছেন; যে জাতিরই হোক, যেখানেই যাক, যেখানেই থাক বা যে দেশেরই হোক দেখা মাত্রই তাদের চেনা যায়। আর বাংলার মানুষ তাদের চিনে ফেলেছে।**

বাস্তব-বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকগণ হিরোসিমার ধংসযজ্ঞকে যায়েজ করার জন্য শেষ পর্যন্ত তাদের পরিত্যাক্ত ধর্মবাদ/ভাববাদের পায়ে মাথা ঠুকে সাক্ষি দিচ্ছেন যে, হিরোসিমায় ঐ অঘটন না ঘটালে আখেরাতে [ভবিষ্যতে] তার দ্বিগুন কি চারগুণ ধংসযজ্ঞ জাপানীরা ঘটাতো!! সুতরাং আমেরীকা হিরোসিমায় করুণা বর্ষণ করে আখেরাতের আজাব থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে রক্ষা করেছে। ভাববাদটি মোহাম্মদের ছোট-খাটো মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় কি না!

মুলত দোষটি আমেরীকার নয় বটে! দোষটি হলো আইনেষ্টাইনের। তাদের জন্ম না হলে লাদেনের ভয়ে আমেরীকাবাসী বুসকে অন্তত দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট করতো না। মিথ্যা মামলায় ইরাকে লক্ষ লোকের মৃত্যু হতো না, কোরিয়া-ইরান, দেশকে দেশ শত্রুতা থাকলেও মহা শত্রু হতো না। ইজরাইল ঘাড়ে বসে কান টানতো না।

তাই বলি ভদ্রলোক আইনষ্টাইন ভান্ডে যা দিলেন তার বিনিময় দাবি করে বসে আছেন আস্তিক-নাস্তিক ভান্ড-ব্রম্মান্ডশুদ্ধ। বিজ্ঞানের জন্মই ধর্ম বা ভাববাদে। ভাববাদ ছাড়া বিজ্ঞান মুহুর্তেই থুবড়ে পড়ে; জীব হয় জড়।